অবিস্মরণীয় গৌরবসিক্ত এক অর্জন

সে কী গভীর আবেগ। রাগ, ক্ষোভ, উত্তেজনা, আশা, স্বপ্ন, এক অদ্ভুত বুকফাটা গর্ব। আর কোনও দিন বাঙালি জাতি ঠিক ওই ভাবে ওই উল্লাস উপলব্ধি করতে পারবে কি? **জহর সরকার**

যাঁরা ১৯৭১-এর ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির ক্রমবিকাশ, বিবর্তন ও বাংলাদেশের জন্মের অধ্যায় চোখের সামনে দেখেছেন, তাঁদের অনুভূতি, আর যাঁরা পরবর্তী কালে ওই সব গল্পের কথা শুনেছেন বা পড়েছেন তাঁদের অনুভূতি কখনও এক হতে পারে না। সে এক গভীর আবেগ, যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল রাগ, ক্ষোভ, উত্তেজনা, আশা, স্বপ্ন আর এক অদ্ভুত বুকফাটা গর্ব; আর কোনও দিন বাঙালি জাতি ঠিক ওই ভাবে ওই উল্লাস উপলব্ধি করতে পারবে কি?

ভাষা এক হলেও আমরা ৭৫ বছর আগেই স্বাধীনতার সময় পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ১৯৪৭-এর দেশ ভাগ হয়েছিল স্ব-ইচ্ছায় এবং দুই তরফের সুবিধার্থেই। বাঙালির ঐক্য চূর্ণ করার জন্য অবশ্য জিন্নাকে এক ভয়ঙ্কর দাঙ্গা বাধাতে হয়েছিল। তার আগে-পিছে দুই সম্প্রদায়ের চরমপন্থীদেরই বিষ ও বিদ্বেষ ছড়াতে অনেক খাটতেও হয়েছিল। সেই ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ধরনের টানাপড়েন— কখনও উচ্চশ্রেণির হিন্দু ভদ্রলোকদের বাহ্যিক অহঙ্কার, যার স্বরূপ হিসাবে তাঁরা জোর গলায় দাবি করেছিলেন— আমরা বাঙালি ওঁরা মুসলমান। অন্য দিকে ওয়াহাবি আর ফরায়েজ়িদের বক্তব্য ছিল ইসলামীয় শুদ্ধতা আর বাঙালি সত্তার আপাত বিরোধ। অতএব তাঁরা চরমপত্র জারি করেন, হয় মুসলমান নয়তো বাঙালি, দু'টি এক সঙ্গে অসম্ভব। তাঁদের এই লাগাতার প্রচারকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন কোটি কোটি বাঙালি মুসলমান। ও দিকে গোঁড়া হিঁদুরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে মুসলমানের হাতে খাবার বা জল গ্রহণ করলে জাত আর ধর্ম দু'টিই যাবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও দু'সম্প্রদায়ের লোকই জানতেন, বুঝতেন ও মানতেন যে তাঁদের যৌথ আঞ্চলিক সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সভ্যতার পার্থক্য এতই প্রকট যে বাঙালি সত্তাটিই সব বাধা অতিক্রম করে তার আধিপত্য বিস্তার করতে সফল হয়েছে। আসলে এই অন্তর্নিহিত বাঙালিত্ব আগাগোড়াই ছিল, আর তাঁরা তা উপলব্ধি করলেন যখন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা পূর্বের বাঙালিদের বুঝিয়ে দিলেন যে বাঙালিত্বের কোনও স্থান নেই।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেও প্রচুর দুঃখের সঙ্গে মানতে হয়েছিল যে তাঁরা আর ভারতের শীর্ষে নেই, বরং বাকি বিশ-বাইশটি প্রদেশের মতো একটি অতি সাধারণ রাজ্য। ও-পারের বঙ্গভাষীরা কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁদের মতামত আর আপত্তি একেবারে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছিলেন। পাকিস্তানের উদ্ধত প্রেসিডেন্ট জিন্না ২১ মার্চ ১৯৪৮-এ ঢাকায় এসে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের যথেষ্ট হুমকির সুরে শাসিয়ে গেলেন যে উর্দুকে তাঁদের জাতীয় ভাষা হিসাবে মানতেই হবে। কিন্তু এমন গর্জন সত্ত্বেও তিনি তাঁদের ঘাবড়াতে পারেননি। তাঁর হুমকির উপযুক্ত জবাব দিলেন ভাষা আন্দোলন দিবসের চার শহিদ— আব্দুস সালাম, রফিকুদ্দিন আহমেদ, আবুল বরকত আর আব্দুল জব্বার। রক্তে রাঙা একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বের ইতিহাসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলে স্বীকৃতি পেল ও অমরত্ব লাভ করল। এর জের টেনে প্রায় দুই শতক লড়াই চালালেন ও-পার বাংলার মানুষ। অবশেষে তাঁদের অপরিসীম ত্যাগ ও বীরত্বেরই জিত হল। কয়েক লাখ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি জাতি পেল এক স্বাধীন দেশ।

বরণ: স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর। দমদম বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানান ইন্দিরা গাঁধী। ব্রিগেডে হয়েছিল ঐতিহাসিক সভা। ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

বাংলাদেশের জন্ম অবশ্য দু'পারেরই বাঙালি মানুষের দেশভাগের বেদনা আর বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ কিছুটা কমাল। এত দিন পর বাঙালি সত্তাকে মজবুত করার জন্য যেন নিজেদের স্বভূমি বা স্বদেশ ফিরে পেল বাঙালি, যা তারা হারিয়েছিল পলাশির রণক্ষেত্রে। অতএব ১৯৭১ দু'পারের বাঙালির কাছেই খুবই আবেগপূর্ণ এক ক্ষণ। নতুন বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের কাছে এক গৌরবের বার্তা নিয়ে এল।

আর সব ছাড়িয়ে, মাতৃভাষা নিয়ে এমন সংগ্রামের ইতিহাস বিশ্বের ক'টা দেশেরই বা আছে। সারা বিশ্ব দেখল ভাষার অপরিসীম শক্তি, যা ধর্ম, শ্রেণি ও জাতির ভেদাভেদকে শুধু তুচ্ছ বলেই প্রমাণ করল না, কয়েক লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করল তাঁদের জীবন বলিদান দিতে। শেখ মুজিবের মহান ব্যক্তিত্ব তখন কেবল আকাশছোঁয়াই নয়, তাঁকে একটি বিশাল জাতির মুক্তিদাতা হিসাবে গণ্য করা হল।

আমেরিকার তখনকার ঘৃণ্য ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করাও সময় নষ্ট। তবে স্মরণীয়, ওঁদের বিদেশমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার হেয় করে বলেছিলেন, বাংলাদেশ এক দানপত্র যার চাহিদার কোনও শেষ নেই। দেশটিকে পাকিস্তান শুধু লুটপাট আর ধ্বংসই করেনি, তার অর্থনীতির মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ চূর্ণ করে গিয়েছিল। বিশাল প্রতিবেশী ভারতের পাশে দেশটিকে কতই না ছোট্ট মনে হত। আজ সেই বাংলাদেশ কত বিষয়ে ভারতের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে। ২০০৭-এ ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল অর্ধেক, আর ২০২০-২১'এ সেই আয় আমাদের চেয়ে ২৮০ ডলার বেশি। টানা সাত বছর ধরে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য সব দেশের চেয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব লিঙ্গগত ব্যবধানের সূচকে (গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স) অনেক এগিয়ে। শেষ হিসাব অনুযায়ী ১৫৬টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান লজ্জাদায়ক ১৪০ নম্বরে আর বাংলাদেশ ৬৫-তে। এই নিরীক্ষার বিচার হয় অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ ও তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা-অর্জনের ভিত্তিতে। এর সঙ্গে হিসাব নেওয়া হয় তাঁদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার, যা নারীর ক্ষমতা-অর্জন ও উন্নতির মান চিহ্নিত করে। দেখা যাচ্ছে, এর সব ক'টিতেই ভারত ভয়াবহ ভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে। এমনকি সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রেও একই চিত্র।

এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাঙালি কী ভাবে অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে ও করে চলেছে, এই পরিসংখ্যানগুলি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ১৯৭১-এর আসল তাৎপর্য শুধু বাঙালির সত্তার জয়ই নয়, বাঙালির কর্মক্ষমতা ও তাঁরা কী অর্জন করতে পারেন তার এক দৃষ্টান্তে।